জান-এ-গালিব

জান-এ-গালিব

মির্জা গালিবের
নির্বাচিত কবিতার ব্যাখ্যা

ইনামউল্লাহ খাঁ নাসির

মূল থেকে ভাষান্তর

জাভেদ হুসেন

প্র কা শ ন

অনুবাদকের উৎসর্গ

এই বইয়ের আনন্দ পাঠকদের জন্য।
লেখা প্রস্তুতকালীন ও ফলাফলগত দুর্ভোগ সহ্য করেন
নায়েলা আক্তার।
তার জন্য।

বিষয়সূচি

ভাষান্তর ও অন্যান্য প্রসঙ্গ □ ৭-৮
গালিবের হৃদয় হতে □ ৯-২০
জান-এ-গালিব □ ২১-১০৯
নাম ও উপমা পরিচয় □ ১১১-১১৫

নতুন সংস্করণ প্রসঙ্গে

জান-এ-গালিব বইটি অনূদিত হয়েছে লাহোরের তাজ প্রিন্টিং কোম্পানি প্রকাশিত প্রথম সংস্করণ থেকে। বইয়ে প্রকাশের সন পাওয়া যায়নি। এই সংস্করণ বইটির পূর্ণাঙ্গ ভাষান্তর। জবাব ছাড়া শুধু চিঠিগুলো সংক্ষিপ্ত ভূমিকাসহ প্রকাশিত হয়েছিল ২০০৫ সালে কুমিল্লার প্রত্ন প্রকাশনী থেকে। বর্তমান সংস্করণে চিঠির উত্তর ও ভূমিকাতে বিস্তৃত আলোচনা প্রকাশিত হলো। পুরো টেক্সট আগাগোড়া সম্পাদনা করা হয়েছে। শেরগুলোর অনুবাদ নতুন করে মূলের সঙ্গে মিলিয়ে পরিমার্জন করা হয়েছে। মূলে উল্লেখিত মিথ বা বিশেষ প্রসঙ্গ সম্পর্কে শেষে টীকা দেওয়া হয়েছে। প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে টীকার সঙ্গে কবিতা উদ্ধৃত হয়েছে।

ক্ষেত্র বিশেষে, বাংলা ভাষায় প্রকাশের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিল রাখতে গিয়ে কিছু শব্দ বাদ বা যোগ করতে হয়েছে শুধু মূল ভাবের অখণ্ডতা বজায় রাখার জন্য। লেখার পুরো সময় আমার বন্ধু মাজহারুল ইসলাম যে ধৈর্য, এবং তার চেয়ে বেশি আন্তরিকতা দিয়ে পরামর্শ দিয়েছেন, আমার যথেচ্ছ বানানের প্রুফ দেখেছেন, গালিবের পক্ষ থেকে এর জন্য ধন্যবাদ।

জাভেদ হুসেন
ঢাকা ২০২৩

গালিবের হৃদয় হতে

উর্দু কবিতায় আক্ষেপের পাল্লাটাই ভারী। 'গজল' শব্দটির অর্থের দিকেই দেখুন। এর মূল এসেছে আরবি 'তাগুযুল' থেকে। তার আবার উৎস মরুভূমির ঊষর বিরাণ প্রান্তরে চরে বেড়ানো মায়াবী চোখের হরিণ, যার আরবি নাম 'গাযালা'। তাড়া খেয়ে দিগ্বিদিক ছুটে যখন সে কোণঠাসা, যখন সে বুঝতে পারে পালাবার পথ বা আশা নেই — তখন তার বুক চিরে যে আর্তনাদ ছড়িয়ে পড়ে, শব্দগতভাবে তাকেই বলে 'গজল'।

উর্দু-ফারসি কাব্য ঠিকুজি ঘাঁটলে আরবি ঐতিহ্যে গিয়ে ঠেকে। তাদের থেকে সহজ, প্রাণস্ফূর্ত মরু বাতাসের অস্থিরতাটুকু আপন করে নিল ফারসি কবিতা। কিন্তু বেদুইনদের হাতে অধিকৃত হলেও হাজার চারেক বছরের পুরোনো সভ্যতার গর্ব ছিল ইরানিদের বুকে। ক্লান্ত, দূর প্রাণাগত কিন্তু ঐতিহ্যগর্বী ফারসি কবিতায় তাই নিজ ভাষার ছিন্ন তারের বেদনা বেজেছে। সে বেদনার ভাষা তো মধুর হবেই। না পাওয়ার আনন্দ তো সে-ই সাজিয়ে নেয়, যে হারিয়েছে অনেক।

উর্দু ভাষার প্রথম কবি আমির খসরুর কবিতায় অপরিণত উর্দুতেই তাই পরিণত বেদনার প্রকাশ ঘটে। কবি গেছেন দিল্লি থেকে দূরে, ফিরে দেখেন তাঁর পীর ও মুর্শিদ নিজামউদ্দিন আউলিয়া গত হয়েছেন। গালিব বলতেন, 'আর্তনাদে কোনও সুর থাকে না'।

কিন্তু এই কথাটাও তিনি কত সুরেলাভাবেই না বললেন! খসরুর প্রতিকারহীন বিরহ ব্যথাও বের হয়ে এল এইভাবে :

সুন্দর শুয়েছে মাটির বিছানায়, মুখ ঢেকেছে কালো চুলে
আপন ঘরে চলো খসরু, দেখ চারদিকে আঁধার নামে।

গোরি সোয়ে সেজ পর, মুখপর ডারে কেস
চল খসরু তু ঘর আপনি, সাঁঝরা ভায়ো চৌদেস

খসরুর বাপ-পরদাদা এসেছিলেন ইরান থেকে। সে দেশের সমৃদ্ধি তখন দূর দিকচক্রবালে উধাও। তারও বহু আগে খোদ হাফিজ সিরাজি সৌভাগ্য হরিণ ধরতে ভারতে প্রায় পা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর দেখানো পথে বহু তাবড় ফারসি কবি এসেছেন হিন্দুস্তানে। কিন্তু ফারসির শেষ দিককার অন্ধের যষ্টি আমির খসরু একদিকে খোল থেকে তবলা বানাচ্ছেন, সেতার সংস্কার করছেন, খোদ ইরানবাসীদের অহঙ্কার রক্ষা করছেন ফারসি কাব্য লিখে। কিন্তু পরমপ্রিয়-র চরম বিরহ বেদনাতে তার মুখে দেশি বুলি কেন?

হিন্দি-উর্দু ভাষার রাজনীতি

উর্দু ভাষাকে সৈনিকদের ভাষা হিসেবে ভাবা হয়। সাধারণভাবে এই কথাই প্রচলিত যে এর জন্ম মোগলদের সেনা ছাউনিতে। এশিয়ার বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা সৈনিকেরা নিজেদের মাঝে কথাবার্তা চালু রাখতে গিয়ে এই ভাষার জন্ম হয়। আর উর্দু শব্দটি এসেছে তুর্কি ভাষা থেকে, যার অর্থ হলো 'সেনা ছাউনি'।

এই ভুল ধারণা প্রথম প্রচার হয় ইংরেজ বেতনভুক্ত লেখক মীর আম্মানের বই *বাগ ও বাহারের* (১৮০২) ভূমিকায়। মোগল যুগ শুরু হয় ১৬২৫ সনে বাবরের পানিপথ যুদ্ধে বিজয়ের পর। তার

বহু আগে আমির খসরু-র (মৃত্যু ১৩২৫) মতো কবি উর্দুতে কবিতা লিখে গেছেন। জর্জ এ গ্রিয়ারসনের অধীনে ১৮৯৪ সনে শুরু হয় 'লিংগুইস্টিক সার্ভে অব ইন্ডিয়া'। চলে ৩০ বছর। এর নবম খণ্ডে গ্রিয়ারসন লিখছেন — 'সাহিত্যের হিন্দুস্তানি (উর্দু) ভাষার ভিত্তি হলো দেশি হিন্দুস্তানি ভাষা। এই ভাষায় কথা বলা হয় ঊর্ধ্ব দোয়াব (উত্তর-পশ্চিম ভারত) আর পশ্চিম রোহিলাখণ্ডে।'

এই ভাষাকে 'উর্দু' নামে ডাকা শুরু হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে। আসলে এর নাম ছিল একাধিক — হিন্দুস্তানি, হিন্দি, হিন্দভি, গুজরি, দাকনি, রেখতা, দেহলভি। মোগল আমলে খোদ উর্দু শব্দটির অর্থ দাঁড়িয়েছিল 'রাজ দরবার'। যার কারণে সেখানে কথিত ভাষার নাম হয় — 'যুবানে উর্দুয়ে মুয়াল্লা'। মানে 'সর্বোচ্চ দরবারের ভাষা'। এখানে 'উর্দু' মানে ভাষা নয়, দরবার। পরবর্তীতে ইংরেজরা এই সম্পূর্ণ নামকে সংক্ষিপ্ত করে ভাষার নামই দিয়ে দেয় 'উর্দু'।

ভাষার বংশ বিচার হয় ক্রিয়া দিয়ে। উর্দুর নামপদ আরবি, ফারসি, পশতু, তামিল, ইংরেজি বহু ভাষা থেকে এসেছে। কিন্তু এর নিরানব্বই শতাংশ ক্রিয়া এসেছে সংস্কৃত, প্রাকৃত থেকে। মোটামুটি ১০০০ খ্রিষ্টাব্দে আরবি, ফারসি ও কিছুটা তুর্কি ভাষার সঙ্গে উত্তর ভারতের কথ্য ভাষার আত্তীকরণ শুরু হয়। এই কথ্য ভাষাগুলোর মধ্যে ছিল অপভ্রংশ হতে জন্ম নেওয়া ব্রজ ভাষা, মেওয়াতি, খারি বোলি ও হরিয়ানি। এগুলোর একটা পরবর্তীতে আদি উর্দুর রূপ নেয়।

১৮০১ সালে ইংরেজরা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করে টিপু সুলতানকে পরাজিত করার প্রথম বার্ষিকী স্মরণীয় করে রাখার জন্য। এইখানেই এক ভাষাকে দুই ভাগ করে — হিন্দুদের জন্য হিন্দি আর মুসলমানদের জন্য উর্দু ভাষা তৈরি করা হয়। হিন্দি এবং উর্দু বলতে আলাদা কোনও ভাষা ছিল না, এখনও নেই।

এই ভারতীয় ভাষার জন্মই হয়েছে ভারতবর্ষের বহুভাষা আর সংস্কৃতির মানুষের মাঝে ভাব বিনিময়ের প্রয়োজনে। এর আত্তীকরণ ক্ষমতা জন্মেছে বহুজনকে বহুজনের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে। গরিবের ঘরে জন্মে বড়ো হয়েছে রাজদরবারে। সঙ্গে ছিল সুদূর প্রাচ্য থেকে ভারত পর্যন্ত কাব্য সুষমার নির্যাস, যা তার উত্তরাধিকার। সঙ্গে দূর দেশের হাহাকার। মাওলানা রুমী বাঁশির সুরকে বলতেন — বাঁশঝাড় থেকে বিচ্ছিন্ন হবার সুরেলা আর্তনাদ। তাঁর কথার মরমি ব্যাখ্যা মান্য করেও বললে অত্যুক্তি হবে না যে, উর্দু কবিতাতেও এই বিরহ নাগরিক পোশাক পরেছে। না পাওয়ার বেদনার দীর্ঘশ্বাস আসলে আকাঙ্ক্ষার শক্তির ছদ্মবেশ। গালিবের বহু পরের কবি আসগর গণ্ডগুভি নইলে বুক ফুলিয়ে কেমন করে বলতেন:

হেসে খেলে আমি প্রলয় ঢেউয়ের মাঝে চলি
জীবন সহজ, মসৃণ হবে কেন? সে তো কঠিনই ভালো

চলা যাতা হু হাসতা খেলতা মওজে হাওয়াদিস সে
আগার আসানিয়া হো যিন্দগী তো দুশওয়ার হো যায়ে

'শিকওয়া' খ্যাত আল্লামা ইকবাল এই কাঠিন্যের প্রীতিতে তির তো তির, ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধতাহীন নিস্তরঙ্গ সাগরকেও ত্যাগ করেছেন। তার পেছনে জার্মানির ডক্টরেট ইকবালের কাছে নিৎশের চাইতেও ব্যাপ্ত-সক্রিয় গুরু ছিলেন দুরূহ প্রিয় মির্জা গালিব। ফুলবাগানের গোলাপ প্রেমিক কবিকে যে ব্যাধ আটক করেছে খাঁচায়, কবি সেই ব্যাধের প্রেমেই উড়ে পালাচ্ছেন না:

ব্যাধের প্রেমশিকল আমার পায়ে
নইলে ওড়ার শক্তি ডানায় বাকি আছে

হুঁ গিরিফতারে উলফাতে সৈয়াদ
বরনা বাকি হ্যায় আভি তাকতে পরওয়াজ

একি দূরূহতার প্রেম? উতুঙ্গ গিরিশৃঙ্গর দিকে তাকিয়ে শান্ত গৃহ আঙিনা ত্যাগের চিরাচরিত বাসনা? যাকে পাবো না জানি, আর জানি বলেই তাকে জীবন সমর্পণ? 'আমি ছুটব মিছে তারি পিছে, পাই বা নাহি পাই'-এ তো প্রতিটি জীবনের বাঁকে বাঁকেই আছে, আছে বলেই তা 'সৎ' আর সৎ থেকেই 'সত্য'। কাব্যে জীবনের এই পসরা যোগ না হলে তো গালিবের কবিতা মিথ্যে হয়ে যেত।

গালিবের চিঠি

গালিবের চিঠি উর্দু সাহিত্যের অতি আদরের বস্তু। তাঁর আগে ধড়াচূড়া পরা বাক্যালংকারে প্রায় কুঁজো চিঠি লেখার রেওয়াজ ছিল। লেখাপড়া জানা লোকেরা গদ্যে মনের ভাব প্রকাশ করতেন ফারসি ভাষায়। উর্দুতে গদ্য লেখা তারা অরুচিকর মনে করতেন। স্যার সৈয়দ আহমেদ গালিবের সমকালে গদ্য লিখেছেন। সেই গদ্য ছিল সহজ, কিন্তু তাতে প্রাণ আর রঙের অভাব ছিল। ১৮৪৮ সনে লেখা গালিবের চিঠির তুলনায় স্যার সৈয়দের ১৮৪৬ সনের *আসারে সানাদিদের* ভাষা সেকেলে আর জড়িত-রসনা বলে মনে হয়। গালিবের মন ছিল প্রথম ভারতীয় আধুনিক মানুষের মন। তাঁর লেখা চিঠি আজকের ভাষার মতো বাহুল্যবর্জিত, প্রাত্যহিক জীবন রসে জারিত। তিনি চিঠি লিখতে ভালোবাসতেন। নিজ হাতে খাম তৈরি করতেন, প্রতিদিন চিঠির উত্তর দিতেন। বিষয় একেবারে আটপৌরে থেকে জটিল কাব্যতত্ত্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। উদাহরণ দেওয়া যাক। মুনশি হরগোপাল তুফতাকে লেখা চিঠি:

কী সাহেব, আমার ওপর রাগ কেন? আজ মাসখানেক হলো, নাকি তারও বেশি হবে-তোমার কোনও চিঠি নেই। একটু ভাবো, বন্ধুবান্ধব নিয়ে জমিয়ে থাকা লোক আমি। দুয়েকজন বন্ধু আমার পাশে নেই এমন দেখেছ কখনও?... আর এখন? বন্ধুদের খবর পর্যন্ত পাই না। ...শোন, মাসে অন্তত একটা করে চিঠি লিখবে। এটাকে নিজের জন্য ফরজ ভেবে নাও। দশ-বারো দিন চলে যায়, তোমার কোনও খবর পাই না। কারণ কী? নিজে আসতে না পারো, চিঠি লেখ। না হলে, চিঠি না লেখার কারণটাই লিখে জানাও। দু-পয়সার জন্য কিপটেমি কোরো না। তাও যদি করবে, তো বেয়ারিং চিঠি পাঠাও।

কে ছিলেন মুনশি হরগোপাল তুফতা, গবেষক ছাড়া আজ তা কে খবর রাখে? আমরা আজ কেবল শুনতে পাচ্ছি বহু যুগের ওপার হতে একজন বন্ধুর আকুতি। একাকিত্বে অসহায় হয়ে বন্ধুর কাছে অন্তত চিঠি পাওয়ার বাসনা:

চিঠি লিখব, নাই থাকুক কোনও উদ্দেশ্য
আমি তো তোমার নামেরই প্রেমিক

খত লিখখেঙ্গে গরচে মতলব কুছ না হো
হাম তো আশিক হ্যায় তুমহারে নাম কে

নাসির গালিবের সেই চিঠির ভাষাকেই গালিবের কবিতার অর্থ প্রকাশের ধরন বানালেন।

নাসির যা করলেন

হেগেলীয় দর্শনের ওপর জার্মান দেশ থেকে ডক্টরেট করে আবদুর রহমান বিজনোরি (১৮৮৫-১৯১৮) ৩২ বছর বয়সে গত হবার সময়

তাঁর *মুহাসিনে কালামে গালিব* বইটি শেষ করে যেতে পারেননি। বিস্ময়কর সম্ভাবনাময় বইয়ের প্রথম লাইনটি ছিল:

> হিন্দুস্তানে দুইটি আসমানি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে, একটি পবিত্র বেদ, আরেকটি দিওয়ানে গালিব।

কাব্যবিশারদ আহমদ জাভেদ নিজে নিষ্ঠাবান ধার্মিক মানুষ। তিনি এক কাঠি বেড়ে বলছেন:

> কাব্য যদি হয় ইমান, তবে গালিব অনুরাগী না হওয়া মানে হচ্ছে কাফের হওয়া।

এহেন যে কবির পেডেগ্রি, তাঁর কবিতা নিয়ে আলোচনা কবি খোদ নিজেই শুরু করে গেছেন বন্ধুদের কাছে পাঠানো চিঠিতে। গালিব কাব্যে 'মানি আফরিনি', মানে অর্থ সৃষ্টির পক্ষানুসারী ছিলেন। বিষয় নয়, কাব্যে অর্থ উৎপাদনই ছিল তাঁর অভীষ্ট। ফলে নিতান্ত চতুরতায় একই পঙক্তিতে সমানভাবে সিদ্ধ বহু অর্থ তিনি রেখে গেছেন। তাঁর কবিতা তাই একক অর্থেই আটক হয়ে যায়নি। এই কারণে কবিতাকে কাঁচা বাজারের ফর্দের মতো একার্থে যারা বুঝতে চান তাদের কাছে গালিব 'মুশকিল পসন্দ' মানে দুরূহপ্রিয় বলে খ্যাত হয়েছেন। অপরদিকে মেহনতি কবিতাপ্রেমীরা পেয়েছেন মন ও মগজ খেলানোর অন্তহীন সুযোগ। গালিবের মৃত্যুর কিছু দিন পর গালিবের তরুণ শিষ্য আলতাফ হুসেইন হালি তাঁর *য়াদগারে গালিব* গ্রন্থে প্রথম গালিবের কবিতা ব্যাখ্যার কাজ শুরু করলেন। তার পর থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় পাঁচ শতাধিক ব্যাখ্যা গ্রন্থ বের হয়েছে। লেখকদের মধ্যে পীর সাহেব, অধ্যাপক, কবি, নাট্যকার থেকে বিলেতের সাহেব পর্যন্ত শামিল হয়েছেন। এই দীর্ঘ তালিকায় ইনামুল্লাহ খান নাসির বিশিষ্টতা দাবি করেন। আর সব ব্যাখ্যা-গ্রন্থ ব্যাখ্যাতেই সন্তুষ্ট। নাসির তাঁর *জান-এ-গালিব* বইয়ে গালিবের ব্যাখ্যাকে সাহিত্য সৃষ্টির

পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে উর্দু বহু-শ্রুত কবি মির্জা আসাদুল্লাহ খান 'গালিব'-এর কাব্যের সংক্ষিপ্ত তফসির। ভাব, উপমা ব্যঞ্জনা, গভীরতম দার্শনিক রাহসিকতা, আত্মপরিহাস আর এর সঙ্গে অদ্যাবধি অনতিক্রম্য দক্ষতার সঙ্গে অসম্ভব শব্দ সংযম — তাঁর কাব্য আস্বাদনে পাঠকের সক্রিয় সহযোগিতা দাবি করে।

গালিব যে কারণে কবিতা লিখতেন, নাসির তাকে কল্পনা করে নিয়েছেন গালিবের কোনও দূরদৃষ্ট প্রিয়া বলে; যার নাম জানা যায় না, যে কবির কাব্যে প্রকাশিত সব ভাবের ঘনীভূত রূপ। গালিবের কাব্যের প্রেক্ষাপটকে বিশ্লেষণের জন্য তিনি বড়ো চমৎকার উপায় বেছে নিয়েছেন। নাসির, গালিবের জবানিতে চিঠি লিখেছেন তার সেই প্রিয়ার কাছে 'জান-এ-গালিব' সম্বোধন (গালিবের প্রাণ) করে। প্রিয়ার নির্দয়তা, আশা নিয়ে আশা ভঙ্গ, সূক্ষ্ম আত্ম-পরিহাস, গভীর আত্ম-বেদনা, জগৎ-সংসারের পাষাণভার হয়ে চেপে বসাতেও ধুলো হয়ে সূর্যে পৌঁছানোর স্পর্ধা... এর ফাঁকে গালিবের কবিতার পঙক্তি স্বতন্ত্র কাব্যমূল্য ধারণ করেও, উদ্দেশ্যার্থে তা কবির কাব্যটীকা। আমাদের কাছে তা সমস্ত উর্দু কাব্যের মূল মেজাজের আয়না।

লেখক প্রসঙ্গে

মূল গ্রন্থকারের নাম ইনামুল্লাহ খান, লেখক নাম নাসির। পাঞ্জাবের লাহোরে বাস। জন্ম ও মৃত্যু নিয়ে তথ্য জানা যায়নি। ছিলেন গদ্যকার ও কবি। তাঁর সম্পর্কে আর কোনও তথ্য পাওয়ার চেষ্টা সফল হয়নি। এখানে উল্লিখিত তথ্য পাওয়া গেছে http://www.bio-bibliography.com থেকে।

তাঁর তিনটি কাব্যগ্রন্থের নামের অর্থ 'গাদ্দার নেতা', 'কৃষক ও মজদুর', 'বিপ্লবের ভোর'। এই সব কবিতা সাম্যবাদী চেতনার